Study Material for →

Semester – II (Bengali Versi

Paper – C-4 Comparative Constitutional System

Special Emphasis on "UK"

Notes material given by

Dr. Amrita Banerjee

Scanned with CamScanner

একক ০১ ❑ ব্রিটিশ সংবিধানের বিবর্তন ও প্রধান নীতিসমূহ

গঠন

০১.১ উদ্দেশ্য

০১.২ প্রস্তাবনা

০১.৩ ব্রিটিশ সংবিধান

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস

ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

আইনের অনুশাসন

০১.৪ সারাংশ

০১.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

০১.৬ উত্তরমালা

০১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

০১.১ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ব্রিটেনের যে শাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে কিভাবে তা বর্তমান রূপ নিয়েছে।
- সম্পূর্ণভাবে লিখিত না হলেও সেই দেশের শাসনতন্ত্র কিভাবে কার্যকর হয়েছে।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের এক প্রতিশ্রুতি আইনের অনুশাসনের অর্থ কি এবং
- সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে এখনও ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির প্রভাব কেন সক্রিয়।

০১.২ ❑ প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ সংবিধান হল বিশ্বের প্রাচীনতম সংবিধান। এই সংবিধান কোন সাংবিধানিক পরিষদ দ্বারা ঘোষিত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে এই সংবিধান গড়ে উঠেছে। এই এককে আমরা ব্রিটিশ সংবিধানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব এবং কেন ব্রিটিশ সংবিধান আজও স্বাতন্ত্র্য দাবী করে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

Scanned with CamScanner

০১.৩ ❑ ব্রিটিশ সংবিধান

রাষ্ট্র মানুষের তৈরি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের আয়তন বড়, সদস্যসংখ্যা অনেক এবং সমস্যাও প্রচুর। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নানাবিধ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য একটি সরকার গঠিত হয়। সরকারই রাষ্ট্রের পরিচালন সমিতি। সরকারের মূল কাজ তিন ধরনের ঃ আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ এবং আইনের ব্যাখ্যা। একটি সরকারের অস্তিত্ব, তার কার্যাবলী ও তার ক্ষমতা বন্টন যে নীতিনিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাই হল সংবিধান। বস্তু পরিচালনার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় এই সমস্ত নিয়মকানুনের সমষ্টিকেই সাধারণভাবে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলা হয়।

কোনও দেশের সংবিধান অনেকাংশে নির্ভর করে সেই দেশের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থসামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস ও জনসংখ্যার প্রকৃতির ওপরে। তবে যেহেতু সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য হল নাগরিক অধিকার রক্ষা করা এবং সরকারের ক্ষমতাকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া, সেহেতু সেই পরিপ্রেক্ষিতটিই সংবিধান গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ঃ সংকীর্ণ অর্থে ও ব্যাপক অর্থে। শাসনতন্ত্র হ'ল দেশ শাসনের জন্য সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুন। সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্রের লিখিত মৌলিক আইনকানুন—যার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের সংবিধান চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তা বিশেষ সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা রচিত ও গৃহীত হয়।

কিন্তু এই অর্থে ব্রিটেনে কোনও সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। কারণ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মৌলিক আইনকানুন কোনও একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোনও সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা এই সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়নি।

মুনরো এবং এয়ার্স্ট (Munro And Ayerst) উল্লেখ করেছেন, ব্রিটিশ সংবিধান কোনও একটি উৎস থেকে উদ্ভূত হয়নি। কোন গণপরিষদ অথবা সাংবিধানিক সম্মেলনের মাধ্যমে তা গৃহীত হয়নি। ব্রিটিশ সংবিধানের নিরবচ্ছিন্নতা প্রায় অদৃশ্য বিকাশের ফল। এই সংবিধান এমন একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে যেখানে সনদ, পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, রীতি ও ঐতিহ্য এসে মিলিত হয়েছে।

অনুশীলনী—১

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ব্যবহার করুন)

(ক) ব্রিটিশ সংবিধান একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না।

Scanned with CamScanner

(খ) ব্রিটিশ সংবিধান একটি গণপরিষদের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল।

(গ) রাষ্ট্র মানুষের তৈরি একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

২। সংবিধান দুটি অর্থে ব্যবহৃত হ'তে পারে। সেগুলি কী কী? (পাঁচ বা ছয়টি বাক্যে উত্তর দেবেন)

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস

গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের উৎস হল সনদ (Charter), পার্লামেন্ট প্রণীত আইন (Statute), প্রথাগত আইন (Common Law), সাংবিধানিক রীতিনীতি (Conventions of the Constitution), বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত (Judicial Interpretations and Decisions), আইন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত (Important works on constitutional law and commentaries of the specialists)।

(ক) **সনদ ঃ** গ্রেট ব্রিটেনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ইংল্যান্ডের রাজন্যবর্গ বিভিন্ন রকম সনদকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। ঐতিহাসিক দলিলরূপে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ১২১৫ সালের মহাসনদ, ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদন, ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল প্রভৃতি। এই সনদগুলিকে আমরা ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

(খ) **পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ঃ** ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং সেই সঙ্গে রাজার ক্ষমতা সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে, জনগণের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত এইসব বিধিবদ্ধ আইন ব্রিটিশ সংবিধানের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এইসব বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৬৭৯, ১৮১৬ এবং ১৮৬২ সালে প্রণীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কিত 'হেবিয়াস কর্পাস' আইন, ১৯১১ ও ১৯৪১ সালের 'পার্লামেন্ট আইন' এবং ১৯৭২ সালে প্রণীত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন।

(গ) **বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত ঃ** বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম উৎসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। আদালত প্রথাগত আইন ও পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ব্যাখ্যা করে। আদালতের অনেক রায় সাংবিধানিক দিক দিয়ে গুরুত্ব অর্জন করেছে। আদালতের রায় ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকারের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে।

(ঘ) **প্রথাগত আইন ঃ** দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্র-কর্তৃক এবং বিশেষভাবে আদালত কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জন করলেই তা আইনের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। তবে এই প্রথাগত আইনসমূহ যেমন আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয় না, তেমনি অর্ডিন্যান্স-এর মাধ্যমেও এগুলি ঘোষিত হয় না। তবু এই প্রথাগত আইন ব্রিটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক ও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পুরান আমলের Common Law Court গুলিতে এই প্রথাগত আইন দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়ে এসেছে। রাজা দ্বিতীয় হেনরীর আমলে এগুলিতে সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়।

Scanned with CamScanner

(ঙ) **সাংবিধানিক রীতিনীতি ঃ** সাংবিধানিক রীতিনীতি বলতে আরমা সেই সমস্ত নিয়মকানুনকে বুঝি সেগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হ'লেও তারা আইনের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শাসনকার্যে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকেই এগুলি মান্য করতে হয়। বস্তুত গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের প্রধান ভিত্তি হ'ল সাংবিধানিক রীতিনীতি। রাজা বা রানির ক্ষমতা, ক্যাবিনেটের সঙ্গে সংসদের সম্পর্ক, দলীয় পরিষদের উর্দ্ধে স্পিকারের অবস্থান ইত্যাদি সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘকালের বিবর্তনের মাধ্যমে ওই সব রীতিনীতি গড়ে উঠেছে। ওই সব রীতিনীতির অনুধাবন ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না।

(চ) **বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী ঃ** প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও লেখকদের রচনাবলীও গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম উৎস। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল অ্যানসনের Law and Customs of the Constitution, মে-র Parliamentary Practice, জেনিংস-এর Law and the Constitution ইত্যাদি।

অনুশীলনী----২

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)**

(ক) ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে সাংবিধানিক রীতিনীতি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(খ) ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস মোটামুটি ছয়টি।

(গ) ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদন একটি পার্লামেন্ট প্রণীত আইন।

২। বিধিবদ্ধ আইন বলতে কী বোঝায়? (তিনটি/চারটি বাক্যে উত্তর দিন)।

ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক সংবিধানেরই কয়েকটি নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। ওই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সংবিধানটির মৌলিকতা, ও বিশিষ্টতা সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। ব্রিটিশ সংবিধানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাই।

(১) **অলিখিত সংবিধান ঃ** ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। সনদ, বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, প্রথাগত আইন, সাংবিধানিক রীতিনীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে এই সংবিধান গড়ে উঠেছে। এই সংবিধান কোনও গণপরিষদ, কোনও সাংবিধানিক সম্মেলন অথবা আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয়নি। কোনও একটিমাত্র স্থায়ী এবং বিধিবদ্ধ দলিলরূপে এই সংবিধানকে চিহ্নিত করা যায় না।

(২) **ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনশীলতা ঃ** গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তনশীলতা। এই সংবিধান একটি গতিশীল সংবিধান। অতএব নিরন্তর পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই সংবিধান কখনও পুরনো প্রশাসনিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেনি। ইংরেজ জাতি প্রকৃতিগতভাবে রক্ষণশীল। ফলে তারা ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী। যেমন তারা রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন করেনি। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার ক্ষমতা হ্রাস করেছে।

Scanned with CamScanner

(৩) **সুপরিবর্তনশীল ঃ** সুপরিবর্তনীয়তা ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সংবিধানের পরিবর্তনের জন্য কোন জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। সংসদে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতেই ব্রিটিশ সংবিধানকে পরিববর্তিত করা যায়।

(৪) **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ঃ** নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনের রাজা বা রানি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও এবং রাজা বা রানির নামে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও তিনি দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ। রাজা বা রানি রাজত্ব করেন, দেশ শাসন করেন না।

(৫) **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ঃ** ব্রিটেন হল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। এখানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংস্থা থাকলেও তারা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ন্যস্ত ক্ষমতাই ভোগ করতে পারে।

(৬) **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অনুপস্থিতি ঃ** গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নেই। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আবার লর্ডসভা পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হ'লেও এই কক্ষের বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও আছে।

(৭) **পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা ঃ** পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা বলতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই বোঝায়। আইনগত সার্বভৌমিকতার অধিকারী হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে, যে কোন আইন সংশোধন করতে পারে, যে কোন আইন বাতিল করতে পারে। ব্রিটেনের কোন আদালতই পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না। তবে পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা অবাধ নয়।

(৮) **আইনের অনুশাসন ঃ** ব্রিটিশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল আইনের অনুশাসন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হ'ল আইনের প্রাধান্য, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে আইনের চোখে সাম্য এবং দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ। আইনের অনুশাসনের জন্যই ব্রিটেনের নাগরিকগণ অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারেন বলে মনে করা হয়।

(৯) **সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ঃ** ব্রিটেনকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মাতৃভূমি বলা হয়। ১২৯৫ সালে রাজা প্রথম এডওয়ার্ড Model Parliament আহ্বান করেন। প্রায় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বলা যায় সংসদীয় শাসনের সূত্রপাত। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ব্রিটেনে বর্তমান যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতি, পার্লামেন্টের কাছে মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্বশীলতা, শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব, ক্ষমতা স্বতন্ত্রকরণ নীতির অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(১০) **ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব ঃ** ব্রিটেনে তত্ত্বগতভাবে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'লেও দ্বিদলব্যবস্থা ও সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসনের ফলে কার্যত এখানে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে বর্তমানে ক্যাবিনেটের এই একনায়কত্ব প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদিত নেতৃত্বেরই অন্য নাম।

(১১) **প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য ঃ** বিগত কয়েক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব এত দ্রুত বেড়ে গিয়েছে যে তাঁকেই সরকারের একক পরিচালক হিসেবে গণ্য করা যায়। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি ও জটিলতা এর একটি কারণ। সেই সংগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ক্রমেই বেশি পরিমাণে মান্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে।

(১২) **দুর্বল বিচারব্যবস্থা ঃ** ব্রিটেনে বিচারবিভাগের ক্ষমতা খুব সীমিত। এখানে বিচারবিভাগ পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইন ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু ওই আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না।

(১৩) **সাংবিধানিক রীতিনীতি ঃ** ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় সংবিধানিক রীতিনীতিগুলির মূল্য অপরিসীম। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি এই রীতিনীতিগুলি মেনে চলেন এবং এই রীতিনীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।

(১৪) **দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব ঃ** ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বর্তমান। কার্যত অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকলেও দুটি মাত্র দল—রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। দুটি দলের মতাদর্শ পৃথক বলে এই ব্যবস্থাকে 'সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা' বলা হয়। শাসনের অধিকার চক্রবৎ দুই দলের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকে।

(১৫) **নাগরিক অধিকার ঃ** অন্যান্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মত ব্রিটেনেও নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যেমন আইনের চোখে সমানাধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ভোটদান ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর করার অধিকার ইত্যাদি। তবে সমালোচকদের মতে এখানে শোষণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অধিকার না থাকায় অন্যান্য অধিকারগুলি অনেকাংশে গৌণ হয়ে পড়েছে।

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় ঘটেছে। অভিনব এই শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে আছেন রানি। আরা ব্রিটিশ শাসনববস্থায় অভিজাততন্ত্রের প্রতীক হয় প্রিভি কাউন্সিল এবং লর্ড সভা। আর ব্রিটেনের জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন কমন্স সভা হ'ল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতীক।

অনুশীলনী----৩

১। **সঠিক উত্তরে ☑ দিন ঃ**

(ক) ব্রিটিশ সংবিধান (লিখিত/অলিখিত)।

Scanned with CamScanner

(খ) ব্রিটিশ সংবিধান (সুপরিবর্তনীয়/দুষ্পরিবর্তনীয়)।

(গ) ব্রিটেন একটি (এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র/যুক্তরাষ্ট্র)।

(ঘ) ব্রিটেনে প্রচলিত রাজতন্ত্র (নিয়মতান্ত্রিক/চরম)।

(ঙ) ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (আছে/নেই)।

(চ) ব্রিটেনে (দ্বিদলীয়/বহুদলীয়) ব্যবস্থা প্রচলিত।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উৎস হল সাংবিধানিক রীতিনীতি। এই রীতিনীতিগুলি হ'ল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত সেই নিয়মকানুন যেগুলি আইনের অংশ না হ'লেও শাসনব্যবস্থায় অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এই রীতিনীতিগুলির পিছনে আইন বা আদালতের কোন সমর্থনমূলক আদেশ না থাকলেও শাসনব্যবস্থায় নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিই এই রীতিনীতিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলেন।

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি। যেমন

(ক) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

(খ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

(গ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অমান্য করলে ব্যক্তিকে কোন শাস্তি পেতে হয় না।

(ঘ) অথচ প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক রীতিনীতির বিরোধী কোনো সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ সহজে কার্যকর হতে পারে না।

এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলিকে লর্ড অ্যানসন 'সংবিধানের প্রথা' নামে উল্লেখ করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল তাদের 'সংবিধানের অলিখিত বিধান' নামে অভিহিত করেছেন। ডাইসি ওই নিয়মগুলিকে 'সাংবিধানিক রীতিনীতি' নামে বর্ণনা করেছেন। স্যার আইভর জেনিংস বলেন যে এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আইনের শুষ্ক দেহকে রক্ত-মাংসে জীবন্ত করে তোলে। ওয়েড এবং ফিলিপিস্ বলেন সাংবিধানিক রীতিনীতি হ'ল প্রথা এবং প্রয়োজনীয়তার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নিয়মাবলীর সমষ্টি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের উৎস হল মানুষের সুস্পষ্ট মতৈক্য। অন্যভাবে বলা যায়, এই রীতিনীতিগুলি সে দেশের বিবর্তনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতির (political culture) প্রতিফলন।

আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতি

আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বর্তমান।

(১) আইন নির্দিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা দ্বারা প্রণীত হয়, কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি কোনও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত হয় না।

Scanned with CamScanner

(২) আইন আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

(৩) আইন লিখিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

(৪) আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হ'লে, আইনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক; সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করা বাধ্যতামূলক নয়। অথচ এর বিরুদ্ধাচারণ অতি বিরল ঘটনা।

(৬) আইন লিখিতভাবে পেশ করা যায়। সাংবিধানিক রীতিনীতি লিখিতভাবে পেশ করা যায় না।

(৭) ডাইসির মতে, সাংবিধানিক রীতিনীতি সকল সময় একইভাবে প্রয়োগ হয় না। স্থানকালভেদে এর তারতম্য হতে পারে। কিন্তু আইন সর্বত্র একইভাবে প্রয়োগ করা হয়।

(৮) প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। কিন্তু সুবিধা অনুযায়ী হঠাৎ সাংবিধানিক রীতিনীতি গড়ে তোলা যায় না।

(৯) নির্ধারিত মঞ্চে জনমত যাচাই, দলীয় স্তরে আলাপ আলোচনা সংসদে বিচার বিবেচনার পর আইন তৈরি করা হয়। পক্ষান্তরে সাংবিধানিক রীতিনীতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে নিয়ত ব্যবহারের মাধ্যমে।

(১০) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সাংবিধানিক রীতিনীতি কোনও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে গড়ে ওঠে না।

সাংবিধানিক রীতিনীতির শ্রেণি বিভাজন

গ্রেট ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

(১) **রাজশক্তির ক্ষমতা সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ** এই ধরনের রীতিনীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাজা বা রানি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন; পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে রাজা বা রানি স্বাক্ষর করতে বাধ্য।

(২) **ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ** এই শ্রেণির শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভা কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকবে; প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার সদস্যদের পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষের সদস্য হতে হবে; পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।

(৩) **পার্লামেন্ট সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ** এই শ্রেণির সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বছরে অন্তত একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে; কমন্সসভার অধ্যক্ষ বা স্পিকার দল নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। একমাত্র পার্লামেন্টই সরকারের আয়ব্যয় অনুমোদনের ক্ষমতা রাখে।

(৪) **কমনওয়েলথ সম্পর্কিত রীতিনিতি ঃ** কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের সম্পর্কও

Scanned with CamScanner

সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন কোনও ডোমিনিয়নের অনুরোধ ক্রমেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেই ডোমিনিয়নের জন্য আইন পণয়ন করবে, অন্যথায় নয়। যেমন, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রপ্রধান পদে ব্রিটিশ রাজা বা রানির এখন বিকল্প ব্যবস্থা চালু হয়েছে ঐসব দেশেরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

সংবিধানিক রীতিনীতিগুলি মান্য করার কারণ

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি ভঙ্গ করলে শাস্তির কোন ভয় নেই। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্যও নয়। তাই স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন ওঠে যে সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি মান্য করা হয় কেন?

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আনুগত্যের কারণ হিসেবে ইংরেজ জাতির রক্ষণশীল মানসিকতা ও ঐতিহ্যপ্রিয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত ও প্রথাগত হওয়ার ব্রিটেনে একটি সুপরিবর্তনীয় শাসন কাঠামো গড়ে তুলেছে। এই সুপরিবর্তনীয়তার প্রতি জনগণের পূর্ণ সমর্থন আছে।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এই রীতিনীতিগুলি শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে। রীতিনীতি লঙ্ঘিত হ'লে শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। যেমন বৎসরে অন্তত একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন না হলে সরকারের আয়ব্যায় অনুমোদনই লাভ করবে না।

অগ্ (০৯৯)-এর মতে সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করার প্রধান কারণ হ'ল জনমতের চাপ। এই রীতিনীতিগুলির প্রতি গ্রেট ব্রিটেনের জনগণের অভ্যস্ত আনুগত্য সরকারকে রীতিনীতি মানতে বাধ্য করে।

সাংবিধানিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে আর একটি শক্তিশালী যুক্তি হল এই যে রীতিনীতি লঙ্ঘিত হলে লঙ্ঘিত নীতিকে আইনে রূপান্তরের দাবি শক্তিশালী হয়ে উঠবে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে সাংবিধানিক রীতিনীতির বাস্তব উপযোগিতার কারণেও এগুলিকে মান্য করা হয়। এই রীতিনীতিগুলি মান্য করার মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনে গণসার্বভৌমিকতার ধারণা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে।

সাংবিধানিক রীতিনীতির গুরুত্ব

বর্তমানে জটিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সব রাষ্ট্রই একটি লিখিত সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তা ছাড়া লিখিত সংবিধান ব্যতীত দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এখন পর্যন্ত মূলত রীতিনীতি নির্ভর। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে ব্রিটেনে এই সাংবিধানিক রীতিনীতির অপরিহার্যতার পশ্চাতে এমন অনেক কারণ আছে যা তাদের ভূমিকাকে এত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

(১) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আইনের কাঠামোকে গতিশীল করে সম্পূর্ণতা দান করে।

(২) এই রীতিনীতিগুলি সংবিধানকে যুগোপযোগী করে তোলে।

Scanned with CamScanner

(৩) গ্রেট ব্রিটেনের বিদ্যমান শাসনতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে সংবিধানের কার্যপদ্ধতি যেন সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও রীতিনীতির উদ্দেশ্যে।

(৪) রীতিনীতিগুলি সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(৫) সাংবিধানিক রীতিনীতি সংবিধানের নমনীয়তা বজায় রাখে ও তার সীমাবদ্ধতা দূর করে।

(৬) সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে পুরনো আইন নতুন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

(৭) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে এই রীতিনীতিগুলি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৮) আইন ও বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যেকার ফাঁকটুকু পূরণ করে এই রীতিনীতিগুলি।

(৯) জনগণের ইচ্ছা ও সরকারি কর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি।

অনুশীলনী ---- ৪

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)**

(ক) ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলির পিছনে আদালতের সমর্থন আছে।

(খ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অমান্য করলে কোন শাস্তি পেতে হয় না।

(গ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি নির্দিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক প্রণীত।

(ঘ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

২। আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

৩। সাংবিধানিক রীতিনীতি কয় প্রকার ও কী কী?

৪। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি কেন মান্য করে চলা হয়?

আইনের অনুশাসন

গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮ খ্রিঃ) পর থেকেই আইনের অনুশাসনের ধারণা ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডে প্রসারলাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদ শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং চিন্তার ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। এইসময় আইনের অনুশাসনের ধারণা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের বক্তব্যের মাধমে জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বলাভ করে।

সহজ সরল ভাষায় আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায় আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য, আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার, নির্দিষ্ট আইনভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগপ্রদান, প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার প্রভৃতি। আইনের অনুশাসনের মূল কথা হ'ল সকলেই আইনের অধীন। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক ডাইসি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Introduction of the Law of the Constitution ('শাসনতান্ত্রিক আইনের ভূমিকা')-এ আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেন। ডাইসির বাখ্যা অনুসারে আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটি তিনটি নীতির

Scanned with CamScanner

ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি হল ঃ

প্রথমত, আইনের অনুশাসন সব রকম স্বৈরী ক্ষমতার বিরোধী। সরকারের কোন স্বৈরী ক্ষমতা থাকতে পারে না। এর অর্থ হ'ল আদালতের চোখে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না অথবা তাকে জীবন ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এর মাধ্যমে আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। ব্রিটেনে আইনের সর্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বলা যায় ব্রিটেনে আইনের অনুশাসনের অস্তিত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আইনের অনুশাসন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে নয়। সকলেই আইনের চোখে সমান। ক্ষমতা, অবস্থা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিকই দেশের সাধারণ আইনের অধীন। ডাইসি উল্লেখ করেছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ পুলিশ কর্মচারী ও সরকারি কর আদায়কারীগণ অন্যান্য নাগরিকের মতই আইন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য সমভাবে দায়িত্বশীল।

ডাইসি আইনের অনুশাসন নীতির বিন্যাসের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রাশসনিক আইনের ধারণাকে গ্রহণ করেন নি। ফ্রান্সে প্রশাসনিক কর্মচারীদের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক আদালত ছিল। ডাইসির মতে, এই নীতির প্রয়োগ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনে নাগরিকদের অধিকার সাধারণ আইন দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে। অনান্য দেশে যেভাবে সংবিধানের বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা নাগরিক অধিকার স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হয়, গ্রেট ব্রিটেনে সেইসব বিধিবদ্ধ আইন ব্যক্তি স্বাধীনতার উৎস নয়। পক্ষান্তরে বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তই নাগরিক অধিকার সংরক্ষিত করে। বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তকে অধিকারের উৎসরূপে গণ্য করা হয়। বিচারবিভাগ প্রধানত দেশের প্রথাগত আইন ও পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে।

ইংল্যান্ডে আইনের অনুশাসনতত্ত্বের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারের মূলে আছে তার অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠোমোর দ্রুত পরিবর্তন। সেই সময় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্র তাদের অধিকারের রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। তৎকালীন পুঁজিবাদী কাঠামোয় অর্থনৈতিক ভিত্তি সংরক্ষণের জন্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের কাঠামো গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক ছিল। ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্ব ওই অর্থনৈতিক ভিত গড়ে তোলার একটি প্রয়াস। আইনের অনুশাসন, আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার এবং আইনের দ্বারা সকলের সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নীতি কার্যকর করতে চেয়েছে। তবে বাস্তবে এই সমানাধিকারের অর্থ হ'ল সম্পদশালীদের সমানধিকার। কারণ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলে নিঃস্ব মানুষের জন্য আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। N.P. মূল্যায়ন ঃ ডাইসির আইনের অনুশাসনতত্ত্ব নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর এই ধারণা ঊনবিংশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। স্যার আইভর জেনিংসের মতে ডাইসির তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর একনিষ্ঠ উদ্যোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও তাঁর এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে নানাদিক দিয়ে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

Scanned with CamScanner

(১) ডাইসির ব্যাখ্যায় সকলপ্রকার স্ববিবেচনামূলক (discretionary) ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালের জটিল সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয়, সেহেতু সরকারের হাতে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা দরকার হয়ে পড়ে। এমনকী ডাইসির সময়েও অনেক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা (prerogatives) আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেনিংস-এর মতে সরকারি কর্তৃপক্ষ ব্যাপক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা ভোগ করে। তিনি উল্লেখ করেছেন ইংল্যান্ডে প্রকৃত স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত।

(২) ডাইসি আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তত্ত্বগতভাবে এই নীতিটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে এই নীতি কতটা প্রযোজ্য সেই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুত ডাইসি আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য যে উদ্যোগে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নিজের দেশেই সেই নীতি সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়নি। আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম সমাজে কোনভাবেই আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অনেক সমালোচকের মতে, ডাইসি যে আইনগত সমতার বিষয় উল্লেখ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে দেশের বিত্তশালী অংশের স্বাধীনতা ও সমতা। দেশের সকল অংশের সমতা নয়।

(৩) ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের তৃতীয় নীতিটিতে বলা হয় যে সাংবিধানিক আইনের দ্বারা নয়, আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকারসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইংল্যান্ডের নাগরিক অধিকারের বেশির ভাগই আদালতের সিদ্ধান্তের ফল নয়। উদাহরণস্বরূপ মহাসনদ, অধিকারের বিল, অধিকারের আবেদন, হেবিয়াস কর্পাস আইন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

(৪) অনেকসময় বিনা বিচারে ও আদালতের রায় ছাড়াই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বার্থের প্রয়োজনে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে আটক করতে পারে। ডাইসির নিজের দেশেই এই ধরনের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণীত হয়েছে। যেমন, ১৯১৪ সালের The Defence of the Realm Act, ১৯৩৯ সালের The Emergency Powers Act ইত্যাদি। এরই অনুসরণে ভারতের সংবিধানের ২২নং ধারা অনুযায়ী নিবর্তনমূলক আটক আইনের ব্যবস্থা আছে।

তবে উপরিউক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে আইনের অনুশাসন আইনগত সমানাধিকার রক্ষা এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্বের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে আইনের অনুশাসন কেবলমাত্র আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকার এখানে স্থান পাইনি। ডাইসি এই তত্ত্বের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদ প্রবর্তিত আইনগত সাম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কোনও পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষেই অর্থনৈতিক

Scanned with CamScanner

সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ডাইসির দেশ গ্রেট ব্রিটেনেও তা সম্ভব হয়নি। আইনের অনুশাসন গণতান্ত্রিক দেশে স্বাভাবিক এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে পদদলিত হয়েছে। তাই মার্কস্‌বাদীরা বলেন যে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় আইন কখনও শ্রেণিস্বার্থের উর্দ্ধে উঠে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হ'তে পারে না।

অনুশীলনী—৫

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)**

(ক) আইনের অনুশাসনের প্রধান প্রবক্তা ডাইসি।

(খ) ব্রিটেনে বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তকে নাগরিক অধিকারের উৎসরূপে গণ্য করা হয়।

(গ) আইনের অনুশাসন আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করেছে।

২। ডাইসি কথিত 'আইনের অনুশাসন' যে তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলির উল্লেখ করুন।

০১.৪ ❑ সারাংশ

সংবিধানের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে অদ্যবধি সম্ভব হয়নি। তাও এককথায় বল যায় যে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি মৌলিক নীতিকে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে।

ব্রিটিশ সংবিধান বিশ্বের প্রাচীনতম সংবিধান। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মৌলিক আইনকানুন কোনও একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোনও সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা এই সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়নি। এই সংবিধান এমন একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে যেখানে সনদ, পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, রীতি ও ঐতিহ্য এসে মিলিত হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবিধান একটি অলিখিত সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। এখানে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা চালু থাকার দরুন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র উপস্থিত। পার্লামেন্ট তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম। কিন্তু বাস্তবে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব, সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদ তাদের কাজের জন্য পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম প্রধান উৎস হল সাংবিধানিক রীতিনীতি। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি এই রীতিনীতিগুলি মেনে চলেন। এই রীতিনীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।

ব্রিটিশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আইনের অনুশাসন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল আইনের

Scanned with CamScanner

০২.১ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ব্রিটিশ গণতন্ত্রে আজও রাজশক্তি কিভাবে টিকে আছে।
- ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা।
- ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।

০২.২ ❑ প্রস্তাবনা

গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা বর্তমান। এই ব্যবস্থায় একজন নাম সর্বস্ব অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক থাকেন যিনি নামে শাসক কিন্তু প্রকৃত কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না। তাঁর নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তিনি হলেন রাজা বা রানি।

ব্রিটেনে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদ। প্রধানমন্ত্রী হলেন ব্রিটেনের প্রশাসনিক কাঠামোয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বহু সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও লেখক গ্রেট ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর শাসিত শাসনব্যবস্থারূপে অভিহিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে তাঁর ক্যাবিনেট। এই ক্যাবিনেটই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির মস্তিষ্ক বিশেষ। তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র প্রশাসন আবর্তিত হয় এবং আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের সংযোগ রক্ষিত হয়।

০২.৩ ❑ রাজা ও রাজশক্তি

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজা ও রাজশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

শক্তির ক্রমবিবর্তন

ব্রিটিশ রাজতন্ত্র বিশ্বের মধ্যে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান যা আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। দীর্ঘ কয়েক শতকের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজশক্তি আজ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্রিটেনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে রাজশক্তির মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। এই রাজশক্তির বিকাশের মাধ্যমেই ওই দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাজা এগবার্টের সময় থেকেই রাজশক্তির সূচনা।

Scanned with CamScanner

একাদশ শতকে রাজা উইলিয়মের সময়ে ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্রের অধ্যায় শুরু হয়। তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত প্রাধান্য লাভ করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে সামন্ত ও যাজকশ্রেণির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে রাজশক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডে টিউডর আমলে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ, নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্থায়িত্ব ও সম্ভাবনা সৃষ্টিতে সাফল্যলাভ করার ফলে টিউডর স্বৈরশাসন দীর্ঘদিন বজায় ছিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের সামাজিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন আসতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত প্রসার সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিতে দুর্বল করে দিতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক উত্থানের জন্য রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তির ভিত্তি ও সামন্তদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। চরম রাজতন্ত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের প্রধান রক্ষক। এই চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানাবার জন্য ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ প্রচারিত হয়েছিল যেখানে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ভিত্তিকে ধ্বংস করার প্রয়োজন ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বেই রাজতন্ত্রের অবাধ কর্তৃত্ব ও সামন্তদের দাপটের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। তারই ফলশ্রুতি গৌরবময় বিপ্লব ১৬৮৮ সালে। এই বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজশক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। পার্লামেন্ট মূল ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং রাজতন্ত্র ক্রমে আলঙ্কারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে এই সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রও জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছিল। বর্তমান শতকেও রাজতন্ত্রের ভূমিকা অব্যাহত আছে। এর কারণ রাজশক্তি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সংরক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

রাজশক্তির ক্ষমতার উৎস

ব্রিটেনে রাজশক্তির ক্ষমতা বলতে একদিকে ব্যক্তি হিসেবে রাজা বা রানির ক্ষমতাকে বোঝায়, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানরূপে রাজশক্তির ক্ষমতাকে বোঝায়। বর্তমানে রাজশক্তি বলতে প্রাতিষ্ঠানিক রাজাকেই বোঝায়। গণতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে ব্যক্তিগত রাজার নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক রাজার নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে।

অতএব আমরা বলতে পারি যে রাজা ব্রিটেনের প্রশাসনিক প্রধান যদিও বাস্তবে তিনি নামসর্বস্ব শাসক অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক।

আমরা জানি যে ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত সংবিধান এবং মুখ্যত তা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্বভাবতই ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্ষমতা কোন সংবিধানে বর্ণিত হয়নি। রাজশক্তির ক্ষমতার প্রধান দুটি উৎস হ'ল ঃ (১) রাজকীয় বিশেষাধিকার (Royal Prerogatives) এবং (২) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন (Statute)।

Scanned with CamScanner

অনুশীলনী---১

১। ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্ষমতার প্রধান দুটি উৎস কী?

২। ব্রিটেনের রাজা বা রানির বিশেষাধিকার সম্পর্কিত রীতিনীতির দুটি উদাহরণ দিন।

৩। ব্রিটেনের রাজা বা রানির বিশেষাধিকার বলতে কী বোঝায়?

রাজশক্তির ক্ষমতা

ক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী রাজশক্তির ক্ষমতাকে শাসনসংক্রান্ত, আইনসংক্রান্ত, বিচারসংক্রান্ত এবং অন্যান্য ক্ষমতা—এইভাবে ভাগ করা যায়।

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা—তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনে শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা রাজা বা রানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখানে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'লেন রাজা বা রানি। শাসন সংক্রান্ত সব ক্ষমতাই রাজা বা রানির নামে প্রয়োগ করা হয়। শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(ক) যাতে আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তা দেখা এবং তাকে সুনিশ্চিত করা।

(খ) প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করা এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করা; শাসনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বিচারকদের নিয়োগ করা; স্থল, নৌ, বিমানবাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করা।

(গ) এইসব কর্মচারীদের অপসারণ করা।

(ঘ) স্থল, নৌ, বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে সামরিক বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া।

(ঙ) রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা রাজার হাতে ন্যস্ত। বৈদেশিক কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্রও তিনি গ্রহণ করেন।

(চ) আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন করা।

(ছ) যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করা।

(জ) ডমিনিয়ান ও উপনিবেশগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করা। রাজা ডমিনিয়ানসমূহের ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করেন।

আইনংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ ব্রিটেনে রাজা বা রানি পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রিটেনে পার্লামেন্ট বলতে রাজাসহ পার্লামেন্টকে বোঝায়। কারণ ব্রিটেনের রাজা বা রানি এবং লর্ডসভা ও কমন্সসভাকে নিয়েই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত।

ব্রিটেনে পার্লামেন্ট গঠনে রাজার ভূমিকা নেই। কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজা এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজা বা রানির আইনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

Scanned with CamScanner

(ক) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতাবলে রাজা বা রানি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত রাখেন এবং প্রয়োজনে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন।

(খ) পার্লামেন্টের পাশ হওয়া বিল রাজা বা রানির সম্মতিলাভ করলে আইনে পরিণত হয়।

(গ) ব্রিটেনের রাজা পার্লামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী এই ভাষণ রচনা করেন।

(ঘ) রাজশক্তির কিছু আদেশ জারির ক্ষমতাও আছে। এই আদেশ জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাসন বিভাগীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এই আদেশকে সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) বলা হয়।

(ঙ) রাজা বা রানি অনেক সময় পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। তবে রাজা বা রানি তাঁদের আইনসংক্রান্ত সব ক্ষমতাই মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করে থাকেন। বস্তুত আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজার ক্ষমতা নিতান্তই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ক্ষমতার অনুরূপ।

(চ) রাজা বা রানির পূর্বসম্মতি নিয়ে কমন্সসভার অর্থ বিল ও বার্ষিক বাজেট পেশ করা হয়।

বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাজা বা রানিকে ব্রিটেনের সকল ন্যায়বিচারের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বা রানি তাঁর বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তাঁর বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) রাজা বা রানি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন।

(খ) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ আবেদনের ভিত্তিতে তিনি বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে পারেন।

(গ) রাজা বা রানির নামে সকল প্রকার বিচার পরিচালিত হয় এবং রাজার নামে অপরাধীদের দন্ড দেওয়া হয়।

(ঘ) রাজা বা রানি বিচারালয়ে দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দন্ড হ্রাস বা মুকুব করতে পারেন।

(ঙ) কমনওয়েলথ ভুক্ত কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং উপনিবেশগুলির বিচারালয় থেকে আসা আপিল বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বিচারকার্য সম্পাদন করেন।

অন্যান্য ক্ষমতা ঃ

(ক) ব্রিটেনের রাজা বা রানি ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের চার্চের প্রধান। এই দায়িত্ব থেকেই তিনি প্রধান যাজক ও অন্যান্য যাজকদের নিযুক্ত করেন। চার্চের বিভিন্ন বিধি ও আইনসমূহ রাজার অনুমতিসাপেক্ষ। তবে চার্চ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারবিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজা বা রানির সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চের কোনও সম্পর্ক নেই।

Scanned with CamScanner

(খ) ব্রিটেনের রাজা বা রানির হাতে সম্মানজনক উপাধি বন্টনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই জন্য রাজা বা রানিকে সকল সম্মানের উৎস বলা হয়। ব্রিটেনে নববর্ষ, রাজ্যভিষেক অথবা রাজা/রানির জন্মদিন উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানসূচক উপাধি ও পদবি বন্টন করা হয়।

ব্রিটেনের রাজা বা রানি ইংল্যান্ডের এবং স্কটল্যান্ডের চার্চের প্রধান চার্চের বিধি ও আইনসমূহ রাজার অনুমতি সাপেক্ষ।

ব্রিটেনের রাজা বা রানি কমনওয়েলথ-এর প্রধান। তাঁর মাধ্যমেই ব্রিটেনের সঙ্গে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সংযোগ রক্ষিত হয়েছে।

অনুশীলনী ---- ২

১। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে?

২। ব্রিটেনে রাজা কোন্ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন?

৩। সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) কাকে বলে?

৪। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের যে কোনও একটি বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার উল্লেখ করুন।

রাজশক্তির ক্ষমতার মূল্যায়ন

ব্রিটেনের রাজশক্তির পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে দুটি পরস্পরবিরোধী মতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম মতের সমর্থকরা রাজা বা রানিকে ব্রিটেনের প্রকৃত শাসক বলে চিহ্নিত করে তাঁর বিপুল ক্ষমতার উল্লেখ করেন। ওয়ালটার বেহজট-এর মতে এখনও রানির পরামর্শদান সতর্ক করার এবং উৎসাহদানের ক্ষমতা আছে। তিনি প্রয়োজনবোধে তাঁর দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীকে স্বমতে আনয়নে বাধ্য করতে পারেন। মন্ত্রীসভা কর্তৃক রাষ্ট্রস্বার্থবিরোধী কোনও নীতি গৃহীত হ'লে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। গঠনমূলক কাজেও রাজা বা রানি মন্ত্রীসভাকে উৎসাহিত করতে পারেন। বার্কারও রাজশক্তিকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার 'ক্রিয়াশীল' অংশরূপে চিহ্নিত করতে চান। রাজশক্তির গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে গ্ল্যাডস্টোন উল্লেখ করেছেন যে ইংল্যান্ডে রাজা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং সামাজিক কাঠামোর শীর্ষে অবস্থিত। তিনি আইন-প্রণেতা, চার্চের প্রধান, ন্যায়বিচার এবং সকল সম্মানের একমাত্র উৎস। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত, আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপন করেন। তিন সার্বভৌম পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন ও কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন।

কিন্তু দ্বিতীয় মতের সমর্থকরা উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করে এই অভিমত পোষণ করেন যে তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনের রাজা বা রানি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হ'লেও বাস্তবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজা বা রানি পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি

Scanned with CamScanner

রাজত্ব করলেও শাসন করেন না। বস্তুত রাজা বা রানি ক্ষমতাহীন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। এককথায় কোনও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেই রাজা বা রানির ব্যক্তিগত ভূমিকার কোন মূল্য নেই।

কিন্তু সঠিক অবস্থা যথার্থ পর্যালোচনা করলে রাজা বা রানির পদমর্যাদা সম্পর্কে উপরোক্ত দুটি অভিমতের কোনও একটিকে এককভাবে সমর্থন করা যায় না। দু'ধরনের বক্তব্যের মধ্যেই কিছুটা সত্যতা নিহিত আছে। কারণ বর্তমানের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী তথ্য মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাকে এখনকার দিনে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করা যায় না। যেমন, কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে রাজা বা রানি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমত অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। কিন্তু কমন্সসভায় নির্বাচনে কোনও দল যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় সেক্ষেত্রে রাজা বা রানি নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করতে পারেন।

অতএব আমরা বলতে পারি যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মত চলার ক্ষেত্রে রাজা বা রানির বাধ্যবাধকতা থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করে রাজা বা রানির দক্ষতা, যোগ্যতা ও বুদ্ধি বিবেচনার ওপর।

স্যার আইভর জেনিংস রাজার চারটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, (১) রাজা বা রানির প্রভাব সংবিধানের সকল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। (২) তাঁর প্রভাব কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে। (৩) তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈকিত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং (৪) রাজনৈতিক এলাকার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করেন।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের স্থায়িত্বের কারণ

(১) সাংবিধানিক সুবিধা ঃ রাজা বা রানি বর্তমানে সাংবিধানিক ভূমিকাই পালন করেন। তাই রাজশক্তি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয় না। আইভর জেনিংস-এর মতে রাজা বা রানিই শাসনতন্ত্রকে ধরে রেখেছেন।

(২) রাজপদের ব্যবহারিক মূল্যঃ ব্রিটেনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজপদের ব্যবহারিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় নীতি ও দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার পরামর্শদাতা হিসেবে রাজা বা রানির পরামর্শের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

(৩) রাজা বা রানি নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল ঃ যুদ্ধ, জাতীয় সংকট অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দিশেহারা মানুষ

রাজা বা রানিকেই নিরাপত্তার প্রতীক বলে মনে করেন। জনগণের এই মানসিকতাই ব্রিটিশ রাজতন্ত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে বাঁচিয়ে রেখেছে।

Scanned with CamScanner

(৪) **দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে অবস্থান ঃ** রাজা বা রানি কোনও বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর নেতা নন, তিনি আপামর জনসাধারণের রাজা। জনগণের এই অনুভূতিই ইংল্যান্ডের রাজা বা রানিকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীকে পরিণত করেছে।

(৫) **সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য ঃ** আর্নেস্ট বার্কারের মতে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষা করে রাজশক্তি এবং সেই জাতিকে বৈপ্লবিক অস্থিরতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

(৬) **সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের উপস্থিতি। ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজা বা রানি এই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করেন। রাজা বা রানির বিকল্প কোনও পদ এখনও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

(৭) **রাজতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ ঃ** ব্রিটিশ রাজতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বরং গণতন্ত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়েছে। এই গণতন্ত্রীকরণের জন্যই ব্রিটেনে রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে।

(৮) **রাজশক্তি ব্যয়বহুল নয় ঃ** অনেক বিশেষজ্ঞের মতে মার্কিন অথবা ফরাসি রাষ্ট্রপতির জন্য সরকারি কোষাগার থেকে প্রত্যেক বছর যে ব্যয় নির্বাহ হয়, ব্রিটেনে রাজা বা রানির তুলনায় সেই ব্যয় অনেক বেশি। কিন্তু রাজশক্তির সপক্ষে প্রদত্ত এই আর্থিক যুক্তি অনেকসময় গ্রাহ্য হয় না, যে কারণে বর্তমানে চেষ্টা চলছে রাজকীয় ব্যয়ের বহর একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার।

(৯) **ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা ঃ** ব্রিটেনের জনসাধারণের চিন্তাধারা ও রক্ষণশীলতাও রাজশক্তি বজায় রাখার জন্য দায়ী। ঐতিহ্যের প্রতীক এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি এখনও মানুষের আকর্ষণ রয়েছে।

(১০) **অপরিহার্যতা ঃ** ওয়াল্টার বেজহটের মতে রাজা বা রানির অস্তিত্ব ছাড়া ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থা শুধু ব্যর্থই হত না, বিলুপ্তও হ'ত।

(১১) **ধারাবাহিকতা রক্ষা ঃ** আর্নেস্ট বার্কারের মতে ব্রিটেনে রাজশক্তি নিরাচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় অনুপ্রেরণা দেয়। কার্যরত অবস্থায় কোনও প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু বা কোনও প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে অন্য কোনও মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাজা বা রানির হাতেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থাকে।

(১২) **কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে যোগসূত্র ঃ** রাজা বা রানি ছাড়া কমনওয়েলথের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হতো কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

(১৩) **অভিজ্ঞতার যুক্তি ঃ** আজীবন রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন বলেই রাজা বা রানির পক্ষে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব। এই সুযোগ কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নেই।

উপসংহার ঃ বর্তমানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাজা বা রানির ভূমিকার সমালোচনা করে সমালোচকগণ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন।

Scanned with CamScanner

(১) রাজা বা রানি কখনও সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ হ'তে পারেন না।

(২) রাজপদ যেহেতু বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠান সেহেতু সেটি একটি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

(৩) রাজতন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

(৪) রাজা বা রানি সমাজের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন।

(৫) মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায় যে সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাজা বা রানি সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমান ধনতান্ত্রিক যুগেও সেই রাজা বা রানি পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন। সেই জন্যই ব্রিটেনের পুঁজিপতি শ্রেণি রাজা বা রানিকে তাদের শ্রেণিস্বার্থ বিরোধী বলে তো মনে করেই না বরং রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থেই তাকে ব্যবহার করতে চায়। তাই বলা যায় যে ব্রিটেনের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সহায়ক বলেই রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে।

০২.৪ প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রবিন্দু হ'ল ক্যাবিনেট। প্রধানমন্ত্রী হ'লেন সেই ক্যাবিনেটে তোরণের কেন্দ্রপ্রস্তর। তাঁকে কেন্দ্র করেই সরকারি কাজকর্ম আবর্তিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী পদের উৎস

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদের সূচনা শতাব্দীর শেষে ও উনিবংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হলেও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীই হ'লেন ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তিতে সর্বপ্রথম 'প্রধানমন্ত্রী' এই নামটি উল্লিখিত হয়। আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও কোনও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ আইন-এ প্রধানমন্ত্রী পদের কোনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃত ছিল না। ১৯৩৭ সালে 'রাজকীয় মন্ত্রী আইন'-এ প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে প্রথম আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর মর্যাদাও বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন। যখন কোনও একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তখন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যাই দেখা দেয় না। কিন্তু কোনও দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেই সমস্যা দেখা দেয়। তখন প্রচলিত

Scanned with CamScanner

রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হ'লে স্ববিবেচনা প্রয়োগের কোনও সুযোগ ও সম্ভবনা থাকে না।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুখ্যত সাংবিধানিক রীতিনীতি ও প্রথাগত আইনই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস। বিভিন্ন সময়ে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের দ্বারাও তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলী কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আইনগত দিক থেকে না হ'লেও কার্যগত দিক থেকে ব্রিটেনের রাষ্ট্র প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। তিনিই হলেন সিদ্ধান্তগ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মূল্য উৎস। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত দায়িত্ব তিনিই বহন করেন।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যায় ঃ

(১) **কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** নির্বাচনের পর কমন্সসভার যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা বা নেত্রীকেই রাজা বা রানি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং এই দলীয় সংখ্যগরিষ্ঠতার ওপরই তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব নির্ভরশীল। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যাতে তাঁর এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে সেদিকে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হয়। নতুবা কমন্সসভার আস্থা হারালে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। কমন্সসভার ভিতরে ও বাইরে দলীয় সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রধান দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী দলের মতামত ও সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতে হয়।

(২) **মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয় ক্যাবিনেট তোরণের কেন্দ্র প্রস্তর। তিনি হ'লেন মন্ত্রীপরিষদের নেতা। প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করার পর রাজা বা রানি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বা রানি মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন। মন্ত্রীসভার গঠন থেকে শুরু করে পুনর্গঠন বা সমাপ্তিকাল পর্যন্ত এর সাফল্য ও ব্যর্থতা সব কিছুই নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের ওপর। মন্ত্রীপরিষদ ও ক্যাবিনেটের ঐক্য ও সংহতি মূলত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই রক্ষিত হয়। সুতরাং মন্ত্রীপরিষদের নেতা হিসেবে তিনি কতটা যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটকে তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করেন তার ওপরেই নির্ভর করে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সাফল্য।

(৩) **কমন্সসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** প্রধানমন্ত্রী হলেন কমন্সসভার নেতা। কমন্সসভার দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন মন্ত্রী থাকেন বটে, কিন্তু কমন্সসভার কাজকর্ম তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে তিনি মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত কমন্সসভার অভ্যন্তরে উপস্থাপিত করেন এবং তার সমর্থনে ব্যাখ্যা

Scanned with CamScanner

পেশ করেন। কমন্সসভার অভ্যন্তরে বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে কোনও মন্ত্রী অসুবিধায় পড়লে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উত্তর দিতে সাহায্য করেন এবং তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারেন। কমন্সসভায় বিরোধী দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং কমন্সসভার নেতা হিসেবে তিনি কতটা দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন মূলত তার ওপরই নির্ভর করে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সাফল্য।

(৪) **প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানির প্রধান পরামর্শদাতা ঃ** প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানির ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রানি রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এবং বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রানি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রানি কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। ক্যাবিনেটের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তিনি কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রানিকে পরামর্শ দেন। বস্তুত মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রানিকে পরামর্শ দেন।

(৫) **প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রনীতির রূপকার ঃ** প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্যরূপকার। পররাষ্ট্র দপ্তরের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী থাকলেও দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য প্রবক্তারূপে তিনি পরিচিত। আন্তর্জাতিক ঘটনবলী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকেই সরকারি বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাঁর বিদেশ ভ্রমণ কূটনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বলাভ করে। যুদ্ধ ও শান্তি প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীই মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

(৬) **প্রধানমন্ত্রী রানি ও ক্যাবিনেটের যোগসূত্র ঃ** প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট ও রানির মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করেন। সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত তিনি রানির কাছে পেশ করেন। সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রানির মতামত ক্যাবিনেটে পেশ করেন। রানি কোনও বিষয় ক্যাবিনেটের বিবেচনার জন্য পাঠাতে ইচ্ছুক হলে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেই তিনি তা ক্যাবিনেটকে জ্ঞাত করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই দায়িত্বভার পূর্বের মত এখন আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। রানি মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত ও নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন না।

(৭) **আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ঃ** প্রধানমন্ত্রীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হওয়া। কমনওয়েলথ সম্মেলনে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব মূলত প্রধানমন্ত্রীই গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক মর্যাদা

প্রধানমন্ত্রী হলেন গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই সরকারের সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গৃহিত ও কার্যকর হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করেই লর্ড মোর্লি (Lord Morley) তাঁকে 'ক্যাবিনেটরূপী তোরণের মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রস্তরখন্ড' (Keystone of the Cabinet arch) নামে অভিহিত

Scanned with CamScanner

করেছেন। আবার তাঁকে 'সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' (First among equals) বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তবে তাঁর এই ভূমিকা অবশ্যই কয়েকটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। এইসব উপাদানগুলি হলঃ প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর জনপ্রিয়তা, দল ও সহকর্মীদের ওপর প্রভাব, তাঁর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ইত্যাদি। আইনের দিক থেকে সকল প্রধানমন্ত্রী একই ক্ষমতা ভোগ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে কোনও কোনও প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পেরেছেন।

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে সরকারি দলের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই নন, তিনি রাজা, রানি এবং ক্যাবিনেটের যোগসূত্র। তিনি মন্ত্রীপরিষদের নেতা নন, তাঁকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রীসভার উত্থানপতন ঘটে।

আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বহুমুখী ও ব্যাপক ক্ষমতা তাঁকে একনায়কের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। যেহেতু তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন, যেহেতু তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং নিজের দলকে ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারেন, সেহেতু তাঁকে একনায়ক বলাই যুক্তিযুক্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। আসলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে এত বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন যে তাঁকে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রক বলা যায়।

তবে সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সব কিছুর উর্ধ্বে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণমুক্ত একজন সব অর্থে স্বেচ্ছাধীন শাসক নন। কারণ প্রধানমন্ত্রীকেও কতকগুলি বিধি-নিষেধের মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একনায়ক হওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রধানমন্ত্রীর পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক জীবন, জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিগত আর্কষণ তাঁর প্রভাব প্রসারিত করে। জনপ্রিয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় হলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সহজেই সরকারি সিদ্ধান্ত জনমতের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়। তাঁর প্রভাব ও গুরুত্ব রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকী আন্তর্জাতিক পরিবেশের ওপরেও নির্ভরশীল।

আসলে প্রধানমন্ত্রীর কর্মকুশলতা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর। তিনি যদি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন তাহলে শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি ব্যপক ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন। আবার তিনি যদি কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন তাহলে শত অনুকুল পরিস্থিতিতেও তাঁর পক্ষে ক্ষমতা উপভোগ করা সম্ভব নয়। তাই ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইথ-এর বক্তব্যকে সামনে রেখে একথা বলা যায় সে পদাধিকারী যেভাবে ব্যবহার করতে চান প্রধানমন্ত্রীর পদ ঠিক সেইভাবেই তাঁর সামনে দেখা দেবে।

Scanned with CamScanner

অনুশীলনী—৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার _____ _____ দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন।

২। লর্ড মোর্লি প্রধানমন্ত্রীকে 'ক্যাবিনেটরূপী তোরণের মধ্যস্থলে অবস্থিত _____, বলে বর্ণনা করেছেন।

৩। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হলেন মন্ত্রীপরিষদ ও রানির মধ্যে প্রধান _____।

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব

স্যার আইভর জেনিংস ক্যাবিনেটকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রবিন্দুরূপে অভিহিত করেছেন। নির্দেশদানের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হল ক্যাবিনেট। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট দীর্ঘ বিবর্তনের ফল। মধ্যযুগের মহাপরিষদ (Magnum Councilium) ছিল আধুনিক ক্যাবিনেটের প্রাথমিক রূপ। এই পরিষদের সদস্যরা ছিলেন রাজার পরামর্শদাতা। কর ধার্যসহ অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দান করাই ছিল এই পরিষদের সদস্যদের প্রধান কর্তব্য। রাজকার্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সুষ্ঠভাবে কার্য পরিচালনার জন্য রাজা কিউরিয়া রেজিস (Curia Regis) বা ক্ষুদ্র পরিষদ নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। নিয়মিতভাবে এই সংস্থার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত। রাজার প্রধান কর্মচারীদের নিয়েই এই সংস্থা গঠিত হ'ত। কালক্রমে ক্ষুদ্র পরিষদ প্রিভি কাউন্সিলে পরিণত হয়।

ত্রয়োদশ শতকে প্রিভি কাউন্সিল সুষ্ঠু আকার ধারণ করে। প্রিভি কাউন্সিল শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার মূল উৎস ছিল। এই প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়াতে এই সংস্থা নীতি নির্ধারণ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারত না। সেই জন্যই রাজা প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লস্ ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দ্বিতীয় চার্লস্ যে পাঁচজন সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করতেন তাঁদের আদ্যাক্ষর যুক্ত করে ক্যাবাল (Cabal) শব্দের উদ্ভব ঘটে। এই পাঁচজন সদস্য হলেন—ক্লি-ফোর্ড (Cliford), আরলিংটন (Arlington), বাকিংহাম (Buckingham), অ্যাসলী (Ashely), লডারডেল (Lauderdale) । ক্যাবাল-এর কার্য পরিচালনা পদ্ধতি কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। এই ক্যাবাল রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। এই ক্যাবাল থেকেই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি।

আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জের শাসনকালে। তিনি ক্যাবিনেটের সভায় উপস্থিত থাকার নীতি বর্জন করেন। রাজা দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জও ওই একই পদ্ধতি অনুসরণ

Scanned with CamScanner

করেছিলেন। ক্যাবিনেটের সকল সিদ্ধান্ত একজন মন্ত্রী রাজার কাছে পেশ করতেন। এই মন্ত্রীই পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হন। এভাবে একদিকে যেমন রাজার প্রভাব হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমন ক্যবিনেটে একজন প্রাধান্য সৃষ্টিকারী মন্ত্রীরও উদ্ভব ঘটে। অষ্টাদশ শতকে প্রশাসন পরিচালনার প্রয়োজনে ক্যাবিনেটই রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই শতকের শেষভাগে কমন্সসভা ক্যাবিনেটের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় রাজা তৃতীয় জর্জ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার ফলে প্রধানমন্ত্রী পিট সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ক্যাবিনেট ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে সম্পর্ক নির্ধারণকারী বিভিন্ন সাংবিধানিক রীতিনীতির উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে ক্যাবিনেটের কার্যাবলী ও ক্ষমতা সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন ক্যাবিনেট গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে। আবার ক্যাবিনেট এর সফল সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রীগণ কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকেন।

ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীপরিষদ

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভা দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। গ্রেট ব্রিটেনের কমন্সসভার সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাই ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভা গঠন করে। ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভার সদস্যরা সকলেই পার্লামেন্টের সদস্য এবং ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত ঃ গঠনগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি স্পষ্ট। মন্ত্রীসভা ক্যাবিনেটের তুলনায় আয়তনে অনেক বড়। ব্রিটেনের সব মন্ত্রীকে নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের সদস্যই মন্ত্রীসভার সদস্য। কিন্তু মন্ত্রীসভার সব সদস্য ক্যাবিনেটের সদস্য নন।

দ্বিতীয়ত ঃ ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের সব সদস্যই প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য। কিন্তু মন্ত্রীসভার সব সদস্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নন।

তৃতীয়ত ঃ ক্যাবিনেটই রাজা বা রানিকে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু মন্ত্রীসভা এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত।

চতুর্থত ঃ সাধারণত সপ্তাহে একদিন ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। তবে পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন সপ্তাহে দু'বারও ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। কিন্তু মন্ত্রীসভার বৈঠকের ব্যাপারে এই ধরনের কোনও নিয়ম নেই। মন্ত্রীসভার বৈঠক অনিয়মিতভাবেই আহুত হয়।

Scanned with CamScanner

পঞ্চমত ঃ গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট যৌথভাবে একটি টিম হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মন্ত্রীসভার সদস্যগণ সাধারণত নিজের নিজের বিভাগীয় দায়িত্বে কাজ করেন, টিম হিসেবে নয়।

ষষ্ঠত ঃ ক্যাবিনেটের কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মন্ত্রীসভা হল একটি আইনগত সংস্থা।

পরিশেষে বলা যায় যে ক্যাবিনেটের সদস্যদের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেই হয়; ক্যাবিনেট বহির্ভূত মন্ত্রীদের সর্বপ্রকার তথ্যের ভার বহন করতে হয় না।

ব্রিটেনকে ক্যবিনেট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয় বলে মন্ত্রীসভার সঙ্গে ক্যাবিনেটের পার্থক্য নিরূপণ করার অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী —৪

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ক্যাবাল শব্দটি থেকে ক্যাবিনেট শব্দটির জন্ম।

(খ) মন্ত্রীপরিষদ ও ক্যাবিনেটের মধ্যে পার্থক্য আছে।

(গ) ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের সব সদস্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নন।

(ঘ) ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের আইনগত ভিত্তি আছে।

পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেট

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের পরিবর্তে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং পার্লামেন্টের সঙ্গে ক্যাবিনেটের সম্পর্ক নির্ণয় অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

তত্ত্বগত ধারণা অনুযায়ী ব্রিটেনের আইনসভাই আইনপ্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা আজ আনুষ্ঠানিক ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয় তার খসড়া প্রস্তাব করে ক্যাবিনেট এবং তা উত্থাপনও করেন কোনও না কোনও মন্ত্রী। ক্যাবিনেটের সদস্যরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সেহেতু পার্লামেন্ট, বিশেষত কমন্সসভায় সাধারণ সদস্যরা ক্যাবিনেটের প্রস্তাবের বিরোধিতা করার মত সাহস দেখান না।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। উচ্চকক্ষ লর্ডসভা ও নিম্নকক্ষ কমন্সসভা। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে সরকারি আয়ব্যয়ের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমানে কমন্সসভার ভূমিকা কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বাৎসরিক বাজেট কমন্সসভার তরফ থেকে শুধু পেশই করা হয়। কমন্সসভার সদস্যদের

Scanned with CamScanner

বিশেষীকৃত কোনও জ্ঞান না থাকার দরুন কোনও আলোচনা ছাড়াই বাজেট কমন্সসভায় অনুমোদিত হয়। আর অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডসভার কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ফলে এই সুযোগে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং ক্যাবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধি হয়েছে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন করাই পার্লামেন্ট বা আইনসভার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমানকালে জটিল সমাজব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন আইনসভার বেশির ভাগ সাধারণ সদস্যেরই তা থাকে না। তদুপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা বর্তমানে জটিল থেকে জটিলতর হওয়ার ফলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিপুল আইন প্রণয়ন প্রয়োজন তা প্রণয়ন করার সময় ও সুযোগ কোনওটাই পার্লামেন্টের বিশেষত আইনসভার হয় না। এই অবস্থায় পার্লামেন্ট আইনের মূল নীতিগুলি নির্ধারণ করে সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের ক্ষমতা শাসনবিভাগের হাতে অর্পণ করে। একেই বলা হয় অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন। এই অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইনের পরিধি যতই প্রসারিত হচ্ছে ক্যাবিনেটের কর্তৃত্ব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতা ততই সঙ্কুচিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে কমন্সসভার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত বিরোধিতার সম্মুখীন হলে প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভা ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের মাধ্যমে কমন্সসভা গঠনের জন্য রাজা বা রানিকে পরামর্শ দিতে পারেন।

তবে ক্যাবিনেটের ক্ষমতার ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সেগুলি হল ঃ

(ক) ক্যাবিনেট পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করলেও তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না।

(খ) পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব ক্যাবিনেটকে সংযত থাকতে বাধ্য করে।

(গ) পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে প্রশ্নোত্তর পর্ব মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন, বাজেট বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমেও পার্লামেন্ট অর্থাৎ কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনে যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে।

(১) ক্যাবিনেট সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী পার্লামেন্ট প্রণীত কোনও আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ১৯৩৭ সালের 'রাজকীয় মন্ত্রী আইন'-এ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও তা খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতির ওপর নির্ভরশীল।

Scanned with CamScanner

(২) ব্রিটেনে ক্যাবিনেটই মুখ্য শাসক। ক্যাবিনেটই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও প্রয়োগকারী সংস্থা। সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার দায় সমবেতভাবে ক্যাবিনেটকেই গ্রহণ করতে হয়।

(৩) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল, এই ব্যবস্থা দলীয় শাসনব্যবস্থা। কমন্সসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দল সরকার গঠন করে। দলের নেতা রাজা বা রানি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দলের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করার জন্য রানিকে পরামর্শ দেন। প্রত্যেক মন্ত্রী দলীয় নীতি ও শৃংখলার দ্বারা আবদ্ধ। দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্যাবিনেট সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(৪) প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। গত কয়েক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে অনেকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা' নামে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সরকারি নীতি প্রণয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। সরকার ও সরকারি দলের সাফল্য ও প্রভাব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল।

(৫) আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এখানকার সংসদীয় ব্যবস্থায় যেহেতু ক্যাবিনেটের সমস্যরা পার্লামেন্টেরও সদস্য, সেহেতু এখানে এখানে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। ফলে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের পেছনে পার্লামেন্টের সক্রিয় সমর্থন থাকে। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুপস্থিত।

(৬) গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যৌথ দায়িত্বশীলতা। পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের এই দায়িত্বশীলতার প্রকৃতি দুই ধরনের—ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও যৌথ দায়িত্বশীলতা। মন্ত্রীরা যেমন একদিকে কোনও একটি প্রশাসনিক দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত, অন্যদিকে তেমনি মন্ত্রীরা যৌথভাবে সমগ্র ক্যাবিনেটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই কারণেই কোন মন্ত্রীকে যেমন তাঁর দপ্তরের কাজকর্মের জন্য কমন্সসভার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জাবাবদিহি করতে হয়, তেমনি অন্যদিকে ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য ক্যাবিনেটকে যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়।

(৮) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হয়। কিন্তু পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের আস্থা হারালে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতেই হয়।

ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ একমত নন, তবু এককথায়

Scanned with CamScanner

বলা যায় যে অতীতের প্রিভি কাউন্সিল থেকে বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব। তবে আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জ-এর সময় থেকে।

ক. ক্যাবিনেটের গঠন

গ্রেট ব্রিটেন কমন্সসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দল সরকার গঠন করে এবং ওই দলের নেতা বা নেত্রীকে রানি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। এই মন্ত্রীসভা থেকে কোনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। মন্ত্রীসভা পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয়। ক্যাবিনেটেরও স্থায়িত্ব তাই পাঁচ বছর। তবে তার মধ্যে কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সেই সঙ্গে ক্যাবিনেটও বাতিল হয়ে যায়।

কতজন সদস্য নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট গঠিত হবে সে সম্পর্কে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ক্যাবিনেটের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যাও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিযুক্ত কারা হবে প্রধানমন্ত্রীই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাধারণভাবে ১৪ থেকে ২৪ জন সদস্য নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। ১৯২২ সালে গ্রেট ব্রিটেন যে ক্যাবিনেট গঠিত হয়েছিল তার সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪। এটিই ছিল ব্রিটেনের ক্ষুদ্রতম ক্যাবিনেট। আবার ১৯৬৪ সালে প্রধানমন্ত্রী উইলসনের নেতৃত্ব যে ক্যাবিনেট গঠিত হয়েছিল তার সদস্য সংখ্যা ছিল ২৪। ১৯৮৪ সালে মার্গারেট থ্যাচারের ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যা ছিল ২১।

ক্যাবিনেটের সদস্য হতে গেলে সেই ব্যক্তিতে প্রথমত পার্লামেন্টের সদস্য হতে হবে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তির রাজনৈতিক যোগ্যতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত সেই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হওয়া প্রয়োজন। চতুর্থত পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে কাজ করার কিছু অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। পঞ্চমত প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চল যাতে প্রতিনিধিত্ব পায় সেদিকেও প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক্যাবিনেট সাধারণত ট্রেজারির প্রথম লর্ড, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, প্রিভি কাউন্সিলের সভাপতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ক্যাবিনেটের মধ্যে আবার ইনার ক্যাবিনেট, কিচেন ক্যাবিনেট এবং শ্যাডো ক্যাবিনেটও থাকে। প্রথম দুটি হল প্রধানমন্ত্রীর অতি বিশ্বস্ত এবং দলের একেবারে প্রথমসারির নেতাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর অন্য নাম। শ্যাডো ক্যাবিনেট বা ছায়া মন্ত্রীপর্ষদ হল বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতাদের নিয়ে গঠিত একটি বিকল্প গোষ্ঠী। যার সদস্যরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সরকারের এক একটি বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণ করে এবং যদি কখনো মন্ত্রীসভার পতন হয় তখন ওই ছায়া মন্ত্রীপর্ষদই যেন ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তৈরি থাকে।

Scanned with CamScanner

খ. ক্যাবিনেটের কার্যাবলী

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট হল শক্তিশালী কার্যনির্বাহী সংস্থা। ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করতে পারি—

(১) নীতি নির্ধারণ ঃ গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট একটি নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা। জাতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর ক্যাবিনেট নীতি নির্ধারণ করে। ওই নীতির ভিত্তিতেই পরে অন্যান্য বিভাগের নীতি নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব হল ক্যাবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত নীতিকে বাস্তবায়িত করা। ক্যাবিনেট কেবল বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্যই নীতি নির্ধারণ করে না। সম্ভাব্য সকল সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

(২) আইন প্রণয়ন ঃ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুসারেই পার্লামেন্টে বিল উত্থাপিত হয়। সে সব বিষয়ে পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন, ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা সেইসব বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বিলের খসড়া তৈরি করে পার্লামেন্টের কাছে তা পেশ করেন। বর্তমানে কেবল বিল উত্থাপন করেই ক্যাবিনেট ক্ষান্ত থাকে না; পার্লামেন্টে বিলটি অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার দায়িত্বও ক্যাবিনেটকে গ্রহণ করতে হয়।

(৩) অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন ও ক্যাবিনেটের দায়িত্ব ঃ আইন প্রণয়ন পার্লামেন্টের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হলেও নানা করণে এই সংক্রান্ত কিছু ক্ষমতা পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের হাতে হস্তান্তরে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে ক্যাবিনেটের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রণীত আইনের প্রয়োগযোগ্যতা নিশ্চিত করতে, তাকে বিশদ চেহারা দেওয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নানা উপধারা প্রণয়ন এই অর্পিত আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্য।

(৪) পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তাকে বাস্তবে কার্যকর করার ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা থেকে শুরু করে অধিবেশন স্থগিত রাখা বা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে ক্যাবিনেটই রাজা বা রানির প্রধান পরামর্শদাতা। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে ক্যাবিনেটই রাজা বা রানির প্রধান পরামর্শদাতা। পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে কোন্ কোন্ বিল উত্থাপন করা হবে, কোন কোন প্রস্তাবের ওপর কে কে বক্তব্য রাখবেন, সরকার পক্ষের মূল বক্তা কে কে হবেন, বিরোধী পক্ষ বলার জন্য কতক্ষণ সময় পাবে, তার সব কিছুই ক্যাবিনেট কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

(৫) শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ঃ ক্যবিনেটের অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব হল শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন। শাসনবিভাগের ক্ষমতা আইনগতভাবে রানির হাতে ন্যস্ত। তবে বাস্তবে রানি ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী এই ক্ষমতা ভোগ করেন। ক্যাবিনেট প্রশাসনিক কর্তৃত্বের শীর্ষদেশে অবস্থিত। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের দ্বারা নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

Scanned with CamScanner

(৬) **বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন ঃ** প্রশাসনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার। এই সঙ্গতিসাধনের কাজটি করে ক্যাবিনেট বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব পালিত না হলে সরকারের সাফল্য ক্ষুন্ন হয়।

(৭) **পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ঃ** বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নীতি নিধারণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব শাসনবিভাগকেই সম্পাদন করতে হয়। গ্রেট ব্রিটেনে এই দায়িত্ব বহন করে ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটে পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র মন্ত্রী থাকেন। কিন্তু বাস্তবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষমতা এখন ক্যাবিনেটের হাত থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যেমন—আর্জেন্টিনার ফকল্যান্ডে দ্বীপ দখল করার সিদ্ধান্ত এককভাবে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার গ্রহণ করেছিলেন।

(৮) **সংযোগসাধনমূলক কার্যাবলী ঃ** সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল জনসাধারণকে সরকারী নীতি, সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখা। এই কারণে সরকার তথ্যদপ্তর, বেতার, দূরদর্শন, পুস্তিকা, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ, সাংবাদিক সম্মেলন এবং পার্লামেন্ট বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেশ করে। এই তথ্যের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই কারণেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেটও জনসংযোগমূলক কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

(৯) **বাজেট প্রণয়ন ঃ** অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রস্তাব ক্যাবিনেটে পেশ করেন। ক্যাবিনেটে আলোচনার পরই বাজেট চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় বাজেট পেশ করেন। প্রত্যেক মন্ত্রীর দায়িত্ব হল কমন্সসভায় বাজেটকে সমর্থন করা। কমন্সসভায় বাজেট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতে হয়। তাই পার্লামেন্ট বাজেট পেশের আগে ক্যাবিনেটের সভায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়।

(১০) **নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** ক্যাবিনেটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে। যেমন অর্থদপ্তরের সচিব, ক্যাবিনেটের পরিকল্পনা বিষয়ক অফিসার বা রাজপরিবারের কোনও ব্যক্তিকে গভর্নর জেনারেলের পদে নিয়োগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। বিচারপতি রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ইত্যাদি পদে নিয়োগের মূল দায়িত্ব ক্যাবিনেটের। রানির নামে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই নিয়োগ কার্যকর হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। বিংশ শতাব্দীতে তার স্থান অধিগ্রহণ করেছে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের ধারণা। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে ক্যাবিনেটের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর অপ্রতিহত প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর একক ইচ্ছাই ক্যাবিনেটের ইচ্ছায় পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মার্গারেট থ্যাচারের নাম উল্লেখ করা যায়। এই কারণে বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞই গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা' নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

Scanned with CamScanner

০২.৫ সারাংশ

গ্রেট ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এখানে একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক আছেন। তিনি হলেন রাজা বা রানি। তিনি নামে শাসক। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত অছে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের হাতে। ব্রিটেনের এই রাজশক্তি বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজা বা রানির কিছু রাজকীয় বিশেষাধিকার আছে। রাজশক্তির ক্ষমতার আর একটি উৎস হল পার্লামেন্ট প্রণীত আইন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি যে রাজতন্ত্র এখন একটি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এক হাজার বছরের এই প্রতিষ্ঠানটি এখন অবক্ষয়ের দিকে।

ব্রিটেনে প্রকৃত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত আছে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের হাতে। মন্ত্রীপরিষদ সব মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভারই একটি অংশ। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়েই ক্যাবিনেট গঠিত হয়। কোন্ দপ্তর এবং কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা পর্যায়ে উন্নীত করা হবে, তা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংসদীয় সচিবদের নিয়ে মন্ত্রীসভা বা মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। বিংশ শতাব্দীতে তার স্থান অধিগ্রহণ করেছে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের ধারণা। তবে বাস্তবে মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন সর্বোচ্চ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। তাই অনেক বিশেষজ্ঞ ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। তবে তাঁকে একনায়ক বলা যায় কিনা সে বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে পদাধিকারী বিচক্ষণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে এবং পিছনে শাসকদলের দৃঢ় ও সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা থাকলে ব্রিটিশ প্রধনমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন।

০২.৬ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। আধুনিক অর্থে ব্রিটেন ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব কবে থেকে?

২। কমন্সসভা কিভাবে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে?

৩। সংক্ষেপে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কার্যাবলী কী কী?

৪। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়?

৫। ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব বলতে কী বোঝায়?

Scanned with CamScanner